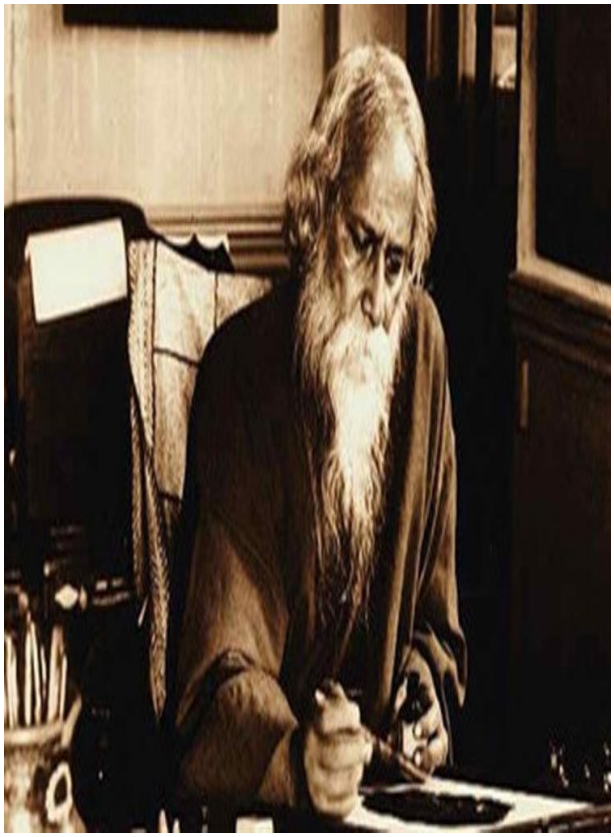
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



জন্ম ৭ মে ১৮৬১
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, কলকাতা, ব্রিটিশ ভারত (অধুনা পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)
মৃত্যু ৭ আগস্ট ১৯৪১ (বয়স ৮০)
সমাধিস্থল কলকাতা
ছদ্মনাম ভানুসিংহ ঠাকুর (ভণিতা)
পেশা-কবি, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও গল্পকার
ভাষা-বাংলা, ইংরেজি
জাতীয়তা-ব্রিটিশ ভারতীয়
নাগরিকত্ব-ব্রিটিশ ভারতীয়
সময়কাল-বঙ্গীয় নবজাগরণ
সাহিত্য আন্দোলন-প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা
উল্লেখযোগ্য রচনাবলি- গীতাঞ্জলি (১৯১০), রবীন্দ্র রচনাবলী, গোরা, আমার সোনার বাংলা, জন গণ মন, ঘরে বাইরে
উল্লেখযোগ্য পুরস্কার- সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার- (১৯১৩)
নাইট উপাধি প্রত্যাখান-১৩ই রপ্রিল ১৯১৯
দাম্পত্যসঙ্গী মৃণালিনী দেবী (বি. ১৮৭৩–১৯০২)
আত্মীয়- ঠাকুর পরিবার

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (অমৃতসর হত্যাকাণ্ড) ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম কুখ্যাত গণহত্যা। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরে ইংরেজ সেনানায়ক ব্রিগেডিয়ার রেগিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। এই শহরের জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি বদ্ধ উদ্যানে সমবেত নিরস্ত্র জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ সরকারের দেওয়া "নাইটহুড" উপাধি ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এফআরএএস (৭ মে ১৮৬১ - ৭ আগস্ট ১৯৪১; ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ - ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)[১] ছিলেন অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক।[২] তাকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়।[৩] রবীন্দ্রনাথকে “গুরুদেব”, “কবিগুরু” ও “বিশ্বকবি” অভিধায় ভূষিত করা হয়।[৪] রবীন্দ্রনাথের ৫২টি কাব্যগ্রন্থ,[৫] ৩৮টি নাটক,[৬] ১৩টি উপন্যাস[৭] ও ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন[৮] তার জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয়। তার সর্বমোট ৯৫টি ছোটগল্প[৯] ও ১৯১৫টি গান[১০] যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় প্রকাশিত ও

গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২ খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী নামে প্রকাশিত হয়েছে।[১১] রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় পত্রসাহিত্য উনিশ খণ্ডে *চিঠিপত্র* ও চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত।[১২] এছাড়া তিনি প্রায় দুই হাজার ছবি এঁকেছিলেন।[১৩] রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতার এক ধনাঢ্য ও সংস্কৃতিবান ব্রাহ্ম পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫][১৬][১৭][১৮] বাল্যকালে প্রথাগত বিদ্যালয়-শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেননি; গৃহশিক্ষক রেখে বাড়িতেই তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৯] আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন।[ক][২০] ১৮৭৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-এ তার "অভিলাষ" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল তার প্রথম প্রকাশিত রচনা।[২১] ১৮৭৮ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার ইংল্যান্ডে যান।[২২] ১৮৮৩ সালে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়।[২২] ১৮৯০ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের শিলাইদহের জমিদারি এস্টেটে বসবাস শুরু করেন।[২২] ১৯০১ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন।[২৩] ১৯০২ সালে তার পত্নীবিয়োগ হয়।[২৩] ১৯০৫ সালে তিনি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।[২৩] ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।[২৩] কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন।[২৪] ১৯২১ সালে গ্রামোন্নয়নের জন্য তিনি শ্রীনিকেতন নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।[২৫] ১৯২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬] দীর্ঘজীবনে তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং সমগ্র বিশ্বে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেন।[২৫] ১৯৪১ সালে দীর্ঘ রোগভোগের পর কলকাতার পৈত্রিক বাসভবনেই তার মৃত্যু হয়।[২৭]

রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ভাবগভীরতা, গীতিধর্মিতা চিত্ররূপময়তা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোম্যান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা ও প্রগতিচেতনা।[২৮] রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষাও কাব্যিক।[২৯] ভারতের ধ্রুপদি ও লৌকিক সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচেতনা ও শিল্পদর্শন তার রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৩০] কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে নিজ মতামত প্রকাশ করেছিলেন।[৩১] সমাজকল্যাণের উপায় হিসেবে তিনি গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামের দরিদ্র মানুষ কে শিক্ষিত করে তোলার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।[৩২] এর পাশাপাশি সামাজিক ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।[৩৩] রবীন্দ্রনাথের দর্শনচেতনায় ঈশ্বরের মূল হিসেবে মানব সংসারকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে; রবীন্দ্রনাথ দেববিগ্রহের পরিবর্তে কর্মী অর্থাৎ মানুষ ঈশ্বরের পূজার কথা বলেছিলেন।[৩৪] সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করতেন।[৩৫] রবীন্দ্রনাথের গান তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি।[৩৬] তার রচিত জনগণমন-অধিনায়ক জয় *হে* ও আমার সোনার বাংলা গানদুটি যথাক্রমে ভারত প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত।[৩৭] মনে করা হয় শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত *শ্রীলঙ্কা মাতা* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়ে লেখা হয়েছে।[৩৮][৩৯][৪০][৪১][৪২]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি: বিবিসি বাংলার জরিপে দ্বিতীয় স্থানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ১৬ই মার্চ ২০২০

দু'হাজার সালে বিবিসি বাংলা একটি 'শ্রোতা জরিপ'-এর আয়োজন করে। বিষয়টি ছিলো - সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? তিরিশ দিনের ওপর চালানো জরিপে শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০ জনের জীবন নিয়ে বিবিসি বাংলায় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ২০০৪-এর ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত।

বিবিসি বাংলার সেই জরিপে শ্রোতাদের মনোনীত শীর্ষ কুড়িজন বাঙালির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আজ তাঁর জীবন-কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালির কাছে বিশেষ একটি নাম। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং তাঁর বিশাল সাহিত্য কীর্তির জন্য তিনি বহু বাঙালির রক্তস্রোতে আজও মিশে আছেন। তিনি ছিলেন একাধারে বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীতকার, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক। এক কথায় বহুমুখী প্রতিভার সম্বন্বয় ঘটেছিল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ কর্মজীবনে।

তবুও তাঁর কবি পরিচিতিই তাঁকে বিশ্ববরেণ্য করে তুলেছিল আর তাই রবীন্দ্রনাথকে ভূষিত করা হয়েছিল 'বিশ্বকবি' বা 'কবিগুরু' নামে। আর তাঁর কবিতাগুচ্ছের জন্য তিনি পেয়েছিলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার।

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এক ধনী ও সংস্কৃতিবান পরিবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ সালের ৭ই মে। বাবা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদাসুন্দরী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের চতুর্দশ সন্তান।

ছোটবেলায় প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষা তিনি নেননি। বাড়িতে গৃহশিক্ষক রেখে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্কুলের বাঁধাধরার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ছোটবেলা থেকেই ছিল তাঁর অনাগ্রহ। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বইয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, যে অল্পকাল তিনি স্কুলে পড়েছিলেন সেসময় স্কুলের পাঠ ও পরিবেশ এবং স্কুলের দিনগুলো তাঁর কাছে কেমন "মুখবিবরের মধ্যে প্রাত্যহিক বরাদ্দ গ্রাসপিণ্ডের মত" লাগত।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বা কলকাতার বাইরে পারিবারিক বাগানবাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করতেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ মাকে হারিয়েছিলেন তাঁর চোদ্দ বছর বয়সে। তাঁর বাবা অনেক সময় কাটাতেন দেশের বাইরে। ফলে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল গৃহভৃত্যদের শাসন ও সান্নিধ্যে। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন তাঁর থেকে বয়সে বড় তাঁর এক ভাগিনার উৎসাহে। সে কবিতা পরে ছাপাও হয়েছিল একটি পত্রিকায়।

তাঁর যখন এগারো বছর বয়স তখন তিনি কয়েকমাসের জন্য বাবার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জায়গা ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। এর মধ্যে পাঞ্জাবে হিমালয় পাহাড় ঘেরা ডালহাউসি শহরে থাকাকালীন বাবার কাছে তিনি সংস্কৃত, ইংরেজি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের নিয়মিত পাঠ নিতেন।

ওই পাহাড়ি শৈলাবাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৩ সালে লিখেছিলেন তাঁর প্রথম গান "গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বালে"। বলা হয় এটি ছিল পাঞ্জাবি একটি ভজনের অনুবাদ। ওই সময় অমৃতসরে এক মাস যখন তিনি বাবার সঙ্গে ছিলেন, তখন বাবা ও ছেলে নিয়মিত যেতেন স্বর্ণমন্দিরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, সেসময় ওই মন্দিরের ভজন সঙ্গীত তাঁর ওপর বড়ধরনের প্রভাব পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যারিস্টারি পড়তে ১৮৭৮ সালে সতের বছর বয়সে ইংল্যান্ডে যান। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তিনি আইনজ্ঞ হন। প্রথমে তিনি সমুদ্রতীরের শহর ব্রাইটনে একটি পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এক বছর পরে লন্ডনে আসেন আইনবিদ্যা নিয়ে পড়তে। কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চার আকর্ষণে সেই পড়াশোনা তিনি শেষ করতে পারেননি।

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন এই সময়ে তিনি শেক্সপিয়র সহ অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যিকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায় দেড় বছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে আইনের পড়া শেষ না করেই তিনি ফিরে যান কলকাতায়।

বিয়ে করেন ১৮৮৩ সালে ১০ বছরের কিশোরী মৃণালিনী দেবীকে। জন্মকালে তাঁর নাম ছিল ভবতারিণী এবং তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির এক অধস্তন কর্মচারীর মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর পাঁচজন সন্তান জন্মেছিল, যদিও দুই সন্তান তাদের বাল্যবয়সেই মারা যায়।

বাবার আদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯০-৯১ সাল থেকে কুষ্টিয়ার শিলাইদহে, সেইসঙ্গে পাবনা, রাজশাহী ও উড়িষ্যায় পৈত্রিক জমিদারিগুলোর তদারকি শুরু করেন। এর মধ্যে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ পরিবার নিয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন।

শিলাইদহে 'পদ্মা' নামে একটি বিলাসবহুল পারিবারিক বজরায় চড়ে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে যেতেন তিনি। তবে গবেষকরা বলেন তিনি প্রজাদের কাছ থেকে নামমাত্র খাজনা নিতেন।
১৯০১ পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছিলেন শিলাইদহে। সেখানে বসেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা ও চৈতালির অসংখ্য কবিতা। গীতাঞ্জলি কাব্যের অনুবাদের কাজও তিনি শুরু করেছিলেন শিলাইদহে।
রবীন্দ্র গবেষকদের অনেকেই বলেন এসময় প্রজাদের কল্যাণে তিনি বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালে তিনি দেখেছিলেন তাঁদের জমিদারিতেই প্রজারা কীভাবে শোষণের শিকার হয়েছেন। প্রজাদের কল্যাণে তিনি সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রও স্থাপন করেছিলেন। ওই সময় তিনি তাঁর গল্পগুচ্ছ বইয়ের প্রায় ৫০টির মত গল্প লেখেন। এসব গল্পে তিনি মূলত গ্রাম বাংলা দারিদ্র ও বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছিলেন।
মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম ছোট গল্প ছিল 'ভিখারিনী'।
রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে সপরিবারে শিলাইদহ ছেড়ে চলে যান পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের কাছে শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ একটি ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৯০১ সালে যা কালক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৯২১ সালে। এই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।
শান্তিনিকেতনে থাকাকালেই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যাকে হারান। তাঁর পিতৃবিয়োগও ঘটে ১৯০৫ সালে।
এসবের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েছিলেন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক লর্ড কার্জন যখন দেখলেন বাঙালিরা স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, তখন তারা ওই আন্দোলন রুখতে সিদ্ধান্ত নিলেন বাংলাকে দুভাগে ভাগ করে দিতে। এর প্রতিবাদে যে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, তার পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ব্রিটিশ সরকারের ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলার নেতারা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে কলম ধরে যে গানগুলো লিখেছিলেন, তা তখন এক অভিনব উন্মাদনা তৈরি করেছিল।
তবে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বেশিদিন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেননি। রাজনৈতিক নেতারা উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলন-সর্বস্ব, গঠননীতি-বর্জিত যে পথ বেছে নিয়েছিলেন তা তিনি সমর্থন করেননি। কিন্তু তাঁর কিছু কিছু জীবনীকার লিখেছেন রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর সায় না থাকলেও, যেহেতু তাঁর মন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল এবং তিনি ছিলেন খুবই সংবেদনশীল, তাই বিদেশি শাসকরা বড় রকম অন্যায় করছে দেখলে তিনি চুপ করে থাকতে পারতেন না।
ব্রিটিশ সরকার ১৯১৫ সালে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ শাসকের প্রবর্তিত এক বিল, যার আওতায় বিনা বিচারে যে কোন লোককে আটক রাখার বিধান পাশ করা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারী প্রায় দুহাজার নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে।
তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁর প্রতিবাদপত্রে লিখেছিলেন, "একদল অসহায় মানুষকে যে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং যেভাবে সে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তার কঠোরতা অপরাধের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। কোন সভ্য সরকার যে একাজ করতে পারে তার কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার যার নির্দেশে চলেছিল জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাযজ্ঞ-
পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ওই মর্মান্তিক গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম অ-ইউরোপীয় যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯১৩ সালে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদের জন্য সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল তার ভাবগভীরতায়। তাঁর সাহিত্যে বিশ্বপ্রেম ও মানবপ্রেমের পাশাপাশি প্রকৃতিপ্রেম, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা আর প্রগতিবোধ প্রকাশ পেয়েছে। কথা সাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি সমাজ, রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও তাঁর মতামত তুলে ধরেছিলেন।

সমাজকল্যাণ, গ্রাম উন্নয়ন ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে তিনি সোচ্চার ছিলেন। শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুল গ্রামে আমেরিকান কৃষি অর্থনীতিবিদ লেনার্ড এলমহার্স্ট এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও ছাত্রদের সহযোগিতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন শ্রীনিকেতন নামে পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র।

এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতিসাধন, সমবায় প্রথা চালু করা এবং গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিপুল সাহিত্যসম্ভারের যেসব হিসাব পাওয়া যায় সে অনুযায়ী তিনি লিখেছিলেন ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ এবং অন্যান্য আরও গদ্য, ৯৫টি ছোটগল্প এবং দু-হাজারের ওপর গান।

প্রায় ৭০ বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকতে শুরু করেন। ছবি আঁকায় তাঁর কোন প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। লেখার কাটাকুটিকে একটা চেহারা দেবার চেষ্টা থেকে তাঁর ছবি আঁকার শুরু। তারপরেও তিনি প্রায় দু হাজার ছবি এঁকেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নিজের দেশে বসেই সাহিত্যসৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। মোট বারোবার তিনি বিশ্বভ্রমণে বেরন। পাঁচটি মহাদেশের তিরিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেন।

সেসময় ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও পূর্ব এশিয়ায় তিনি বিরাট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ইংল্যান্ডে ডার্টিংটন হল স্কুল নামে শ্রীনিকেতনের আদর্শে একটি প্রগতিশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তাঁর ব্যাপক অবদান ছিল। অনেক জাপানি সাহিত্যিক তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা ইংরেজি, ডাচ, জার্মান, স্প্যানিশসহ বেশ কিছু ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক বহু বিদেশি কবি, সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিককে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে জাপান ও উত্তর আমেরিকায় এবং এক অর্থে বাংলার বাইরে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল।

জীবনের শেষ চার পাঁচ বছর ধারাবাহিকভাবে নানা অসুস্থতায় ভুগেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লেখা তিনি কখনও থামাননি। মৃত্যুর সাতদিন আগে পর্যন্তও তিনি ছিলেন সৃষ্টিশীল।

দীর্ঘ রোগভোগের পর ১৯৪১ সালে জোড়াসাঁকোর বাসভবনেই তাঁর জীবনাবসান হয়।